Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.98-103
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’: দেবেশ রায়ের স্বভাষিক তত্ত্বচিন্তার রূপায়ণ

শতাব্দী কর
গবেষক (পি এইচ ডি), বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Nowadays postcolonial theory has become an important field for discussion of study throught the world. In art and literature, especially in novel, colonial story tellers and novelists are writing novels against colonial text through their indigenous and self-spoken theory. In the current disquisition, the famous novelist of Bengali literature, Debesh Roy’s ‘Tistaparer Brittanto’ has been illustrated. In this novel, Debesh Roy has come out of the fixed model of European novel and has inserted a new kind of mordanism in Bengali novel literature. Besides this, the application of ‘polyphonic discours’ of Mikhail Bakhtin’s novel artistry in the structural form of ‘Tistaparer Brittanto’ has been discussed. Moreover, in the present research paper, the essayist-theorist Debesh Roy’s novel philosophy is illustrated according to his own art and literary thought.

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একবিংশ শতকের দীর্ঘ পথে বাংলা সাহিত্যেচর্চার ধারা স্বভাবতই বদলে গিয়েছে অনেকখানি। ইউরোপীয় উপনিবেশের আদল ছেড়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় দেশ-জাতি-ইতিহাস-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্তে জীবনযাপনের বহুমুখী ও জটিল প্রকাশে সাহিত্যের অন্যতম প্রকরণ হিসেবে উপন্যাসচর্চাও বহুবিধ অভিঘাতে ত্বরান্বিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। উপন্যাস কি এবং কেন? একটি অতিনির্দিষ্টি বা অনিদির্ষ্ট পাঠ কীভাবে উপন্যাস হয়ে ওঠে? উপন্যাস সংলগ্ন উপাদানগুলি কোন অভিঘাতে উপন্যাসের অন্তর্দেশ রচনা করে? বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে একজন উপন্যাসকারের উপন্যাসযাপনের বৃত্তান্ত কেমন হতে পারে?-এই সকল প্রশ্নের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখনও অধরা। অথচ সারা বিশ্বজুড়েই উপন্যাস বদলে যাচ্ছে, এমনকি বদলে যাচ্ছে আমাদের উপন্যাসপাঠের চর্চার অভিব্যক্তিও। সেই নব অর্জিত অভিজ্ঞতায় সচেতনভাবে উপন্যাস শিল্পের চর্চাই আমাদের উদ্দীষ্ট হওয়া উচিত।

শিল্প বা সাহিত্য যাই হোক না কেন মৌলিক তত্ত্বভাবনা ছাড়া প্রকৃত শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই তাদের রচনার শিল্পরূপ নিয়ে নীরব। এই নীরবতা যেমন একদিকে উপন্যাস শিল্পের ধারাবাহিক ঐতিহাসিকতার অধ্যয়নকে বিঘ্নিত করে তেমনি উপন্যাসের গঠনচর্চার অভিজ্ঞতাকেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক দেবেশ রায়ই (১৯৩৬-২০২০) সম্ভবত সবচেয়ে সচেতনভাবে উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিজ রচনার তত্ত্ববিশ্ব সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ ও যুক্তি বিন্যাসের প্রচেষ্টায় তাঁর উপন্যাস সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সম্পদ। দেবেশের উপন্যাসের সর্ব্বৈব আলোচনাও তাঁর প্রবন্ধপাঠ ছাড়া অসম্পূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের স্বভূমি দর্শণের আলোকে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮-র জুলাইতে। কিন্তু এর পূর্বেই উপন্যাসটি ভিন্ন ভিন্ন পর্ববিন্যাসে বিভিন্ন প্রত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। ১৯৮০ ও ১৯৮১-র শারদীয় ‘বারোমাস’-এ ‘আদিপর্ব’ ও ‘বনপর্ব’, ১৯৮৪ ও ১৯৮৬-তে শারদীয় ‘কালান্তর’ পত্রিকায় ‘চরপর্ব’ এবং ১৯৮৭-তে শারদীয় ‘প্রতিক্ষণ’-এ ‘অন্ত্যপর্ব’ প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৪। সমগ্র উপন্যাসটি ছয়টি পর্বে বিভক্ত, আবার প্রতিটি পর্বই শিরোনাম যুক্ত। এই বৃহৎ

অধ্যায়ে বিভক্ত একখানি বৃহৎ উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিক একাধারে উপন্যাসের ঐতিহ্যের অনুসরণ ও ঐতিহ্যকে অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতি ও কলোনিযাপনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। কলোনিজীবনের সাহিত্য নির্মাণের এই 'ঐতিহাসিক সময়' পর্বকে সমালোচকেরা 'আধুনিক যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। কলোনিয়াল ডিসকোর্সের দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় ইংরেজ আধিপত্যে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার জন্ম হল প্রাক্-কলোনিপর্বের সাহিত্যের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল। 'উপন্যাসের সংকট' প্রবন্ধে দেবেশের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ-

> "মানুষের সামাজিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী বা আধিপত্যশীল প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির পর্ব, যাকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিকপর্বই বলতে পারি, মাত্র দু-তিনশ বছরের পুরনো, [...]। অথচ যেহেতু সেই পর্বে পৃথিবীর সব-দেশ পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছে অনেক বেশি, তাই শিল্প-সাহিত্যগত প্রশ্নের ওপরও এই আধিপত্যবাদী চিন্তার জবরদখল চালুই থেকে যায়, [...]।"
>
> (উপন্যাসের বিবিধ সংকট ১৭)

দেবেশ রায় এই 'আধিপত্যে'র প্রশ্নে আমাদের সাহিত্যের আধুনিক প্রকরণগুলির মধ্যে বেছে নিয়েছিলন উপন্যাসকে, কেননা-'পরাধীন একটি জাতির অংশ হিশেবে পরাধীন আমাদের ভাষায় উপন্যাসের জন্ম হয়েছে' (রায়, "উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে" ১৬০)। তিনি মনে করেন এই কারনেই উপন্যাসচর্চার একেবারে প্রাথমিক পর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) কিংবা কালীপ্রসন্ন সিঙ্হের 'হুতোম প্যাচার নক্শা' (১৮৬২-৬৫) তে যখন আখ্যান কাহিনির একটি গঠন তৈরী হয়ে উঠছিল তখনই -'বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রথম লাইনের অশ্বারোহীর পদাঘাতে এই ধরণের গদ্যকাহিনীর সেই নানা চেষ্টা অবান্তর উপকরণের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল উপন্যাসের ইতিহাসেরও বাইরে' (রায়, "উপন্যাস নিয়ে" ১৪)। এরই ফলে আমাদের উপন্যাসে ইংরেজী উপন্যাসের মডেল স্বীকৃত ফর্মটিই একমাত্র ফর্ম হয়ে উঠল।

উপন্যাসচর্চার ধারায় পরবর্তী সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা তাদের সৃষ্টি ক্ষমতায় নিজ নিজ স্বভূমি আবিষ্কারের প্রত্যাশায়, বিষয়বস্তুর চাপে আধুনিকতার স্থিরকৃত মডেল থেকে অনেকটাই বেড়িয়ে এসেছিলেন। আরো পরে সতীনাথ ভাদুড়ী 'রাজনীতি আর মানুষজনের ইতিহাসে আর ব্যক্তিগতের এক সমুদ্রমন্থনতুল্য আবর্তে' (৩৯) সেই উপন্যাস কল্পনাকে আকার দিলেন প্রাক্-কলোনিপর্বের আখ্যান কাহিনীর আধারে। ইউরোপীয় উপন্যাসের স্বীকৃত মডেলের প্রতি ঔপন্যাসিকের প্রধান আপত্তি-

> "ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেল আমাদের স্বাদেশিক অখণ্ডতাকে একটা ছাঁচে ফেললেও, সে অখণ্ডতা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয় আর আমাদের সামাজিক বহুবৈচিত্র্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাও ধ্বংস করে। ইউরোপীয় সেই মডেল আমাদের সমাজের মানুষ ও সেই মানুষের জীবন বুঝে নেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।" (রায়, "উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে" ২০)

দেবেশ রায় তাঁর যুগান্তকারী দুই উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'-তে এই বাঁধাকে অতিক্রম করে এক স্বতন্ত্র আধুনিকতার সৃষ্টি করলেন গঠনরীতির মুন্সিয়ানায়, ভাষা শৈলীতে, উপন্যাসের অন্তর্দেশ নির্মাণে।

উপন্যাসের প্লট পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিক আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত ইংরেজী মডেলের অনুসৃত ফর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'তে। সমগ্র উপন্যাসটি যেন কয়েকটি পর্বে, ছোট ছোট এপিসোডে, 'কাকতাল বা আকস্মিক সমাপতন জুড়ে জুড়ে' দেশীয় আখ্যানের পটভূমিকায় এ দেশের মানুষের জীবনচর্চার ছবি। আপাতদৃষ্টিতে পর্ব বা এপিসোডগুলিকে সম্পর্কহীন মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা সম্পর্কশূণ্য নয়। আখ্যান গঠনের এই রীতির সাথে তুলনা হতে পারে আমাদের মঙ্গলকাব্য, চৈতণ্যজীবনী ও আরো পরবর্তীতে পালাগানের কাহিনী বলার এক দেশীয় বিবরণে। দেবেশ তাঁর উপন্যাসে এই বিবরণকেই প্রাধান্য দিলেন, তিনি মনে করেন-

> "আখ্যানকে একটি ছোটগল্প বা একটি বড় উপন্যাসের ভিতর সম্পূর্ণ আটাতে গেলে আখ্যানের সর্বতিশায়িত খর্ব হয়। আখ্যানকে যদি সেই নিগড় থেকে মুক্ত করে দেখা যায় তাহলে তা কখনো

> ছোটগল্পে, কখনো বিবরণে, কখনো উপন্যাসে, কখনো কাহিনিতে ছড়িয়ে যেতে পারে, আবার এই ছড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ভিতর যে ঐক্য থাকে সেটাই সেই আখ্যানের শিল্পগত ঐক্য।"
>
> (গল্প সমগ্র তৃতীয় খণ্ড ১৩-১৪)

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-তে কাহিনীর স্টেরিওটাইপের মধ্যে, অসংখ্য চরিত্রের আসা-যাওয়ার মধ্যে গল্পকথক তার বক্তব্যকে গ্রথিত করে দিয়েছেন নিপূণ মুন্সিয়ানায় আর সেই গ্রন্থনার ফলে কথাবৃত্তের অবয়ব বদলে গিয়েছে, বদলে গিয়েছে চরিত্রের সাথে চরিত্রের সম্পর্ক। আদিপর্বে 'হাটের পথে'র বর্ণনায়-

> "এখন এই রাস্তাটুকু দিয়ে সেই শেষ হাট চলছে। চলতে গেলেই লাইন বাঁধা হয়ে যায়। আর লাইন বাঁধা হয়ে যায় বলেই আকাশের দিকে ফেরানো 'কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র' আর পিঠে ঝোলানো হল্কা ক্যাম্প যেন এই পুরো লাইনটিরই পরিচয় হয়ে উঠতে চায়। যেন, এই পুরো লাইনটাই গিয়ে ঢুকল গো-প্রজননের কৃত্রিম ব্যবস্থায় বা সেটলমেন্টের হল্কা ক্যাম্পে।" (রায়, "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" ১৫)

এই পঙ্‌ক্তির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে পরবর্তী অধ্যায় 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া' এপিসোড। 'হাটের পথে' যাত্রা করেছিল যে যাত্রীদল তারাই এসে দাঁড়িয়েছে 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া' ঘাটে। 'আদিপর্বে'র 'হাটের পথে', 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া', 'সত্যমেব জয়তে', কিংবা 'চরপর্বে'র 'ব্রিজে কেন আলো', 'জগদীশের রাগ', 'বৃক্ষপর্বে'র 'আপলচাঁদ ফরেস্টে রাত তিনটে', 'বাঘারুর বৃক্ষকর্তন' ইত্যাদি ছোট ছোট এপিসোড নিয়ে তৈরী হয়েছে বৃত্ত। আবার সেই বৃত্তের মাঝে মাঝেই লেখক যেন সচেতনভাবেই গ্রথিত করে দেন প্রক্ষিপ্ত অংশ। এই বিবরণই যুগতপৎ দুইটি বৃত্ত বা এপিসোডের মধ্যে 'ঘটনার কালানুক্রম বা ইতিহাস' এবং 'রচনার ঘটনাবিন্যাসের অনুক্রম'কে সংযুক্ত করে। যেমন ছেষট্টি নম্বর ও সত্তর নম্বর এপিসোডে যথাক্রমে 'নির্বাসনের দিকে' ও 'নির্বাসনভূমি'-র মাঝে তিনটি প্রক্ষিপ্ত এপিসোড 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত', 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত', 'কৃষি বিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত' রয়েছে। বাঘারুর জীবনযাপন-জীবন দৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিধির মানুষের বোঝাপোড়া, বাঘারুর স্বভূমি আবিষ্কারের সমবস্থানে রাষ্ট্রব্যবস্থা-রাজনীতি-অর্থনীতির জটিল সম্পর্ক পরোক্ষভাবে বাঘারুর অবস্থানের ব্যাখ্যার সহায়ক হয়ে উঠেছে। আখ্যানের এই বিপরীতরীতি সম্ভব হয় ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ বিবরণের ফলে। আবার এক বৃত্তান্তের কথা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেই সূত্র ধরেই চলে গিয়েছেন আরেকটি প্রসঙ্গে। যেমন 'আদিপর্বে' 'এই হাটটা কেমন' অধ্যায়ে লরি ভর্তি বাঁশ এনে ফেলার আওয়াজ প্রসঙ্গে লেখক অন্য বর্ণনায় পৌঁছে গিয়েছেন-

> "অন্ধকার সেই মাঠের থেকে আওয়াজ উঠে আসে চাপা প্রতিধ্বনির মত, কিন্তু ধারাবাহিক। সেই বাঁশের পাঁজার ওপর সারি সারি বাঁশ ফেলার আওয়াজ। সেই চাপা আওয়াজ একবার শোনা গেলে কানে আসতেই থাকে। থামে না। [...] এমন ধারাবাহিক আওয়াজ ত অন্ধকারের ভেতর থেকে নানা কারণেই উঠতে পারে। দিনেও ওঠে। কিন্তু অন্ধকারেই হয়ত বেশি শোনা যায়। তিস্তা কোন দিকে? কতদূরে? [...]" (২৯)

আবার একই পর্বের 'শেষহাটি থেকে হাট শেষ'-এ এক অশ্বারোহী প্রসঙ্গে-

> "সেই ঘোড়া আর তার অশ্বারোহী এখন এই শূণ্য হাটের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়, যেন এখনো সেখানে হাট, যেন এখনো তাদের মানুষজন ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। কিন্তু এখন আর অশ্বারোহী তার ভিক্ষার ঝুলি কাঠির ডগায় ঝুলিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে না। এখন আর ঘোড়াটিকে পেছনে ধাক্কা খাওয়ায় চমকে উঠতে হয় না। আর অস্পষ্ট চাঁদনিতে সেই ঘোড়া আর অশ্বারোহী ঘুমুতে ঘুমুতে প্রায় নির্জন হাটের অলিগলি দিয়ে পাক খেতে খেতে যেন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বস্তির দিকেই চলেছে। [...]" (৩৪-৩৫)

এই সেই বিস্মৃতপ্রায় উপনিবেশের ল্যান্ডস্কেপ, হারিয়ে যাওয়া নিসর্গ, গ্রথিত করে দেওয়া দৈনন্দিনের খুঁটিনাটি আর বর্তমান সমাজজীবনের তথ্য। উপন্যাসের অন্তর্দেশকে দেবেশ এইভাবেই নির্মাণ করেছেন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-তে।

সাম্রাজ্যবাদের সুদূর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, জাতিরাষ্ট্রের আওতায় কলোনির নতুন সমাজ, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থান, ঔপনিবেশিক 'পরভৃত' জীবনযাপনের দুঃস্বপ্ন, উপনিবেশের বৃহত্তর পৃথিবীর অন্তর্গত এক প্রাদেশিক ভাষায় ঔপন্যাসিক দেবেশ তাঁর উপন্যাসে মেট্রোপলিটান কেন্দ্রের বিপরীতে পরিধির দৈনন্দিন অথচ ঐতিহাসিক বাস্তবতার অন্তর্ঘাত ঘটান। যে বাস্তবতায় কলোনির প্রচলিত বাস্তবতার দেওয়াল ভেঙ্গে যায়-"সে পরিধি যখন মানবিক ও ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, তখন সে সব মানুষ, নিসর্গ ও দিনরাত্রি কেন্দ্রের বিপরীত এক অন্বয় অনিবার্যত পেয়ে যায়।" (রায়, "উপন্যাস নিয়ে" ৭৮) ঔপন্যাসিক একথা স্বীকার করেছেন যে-"আমার ভিতরে একটা বিষয় যখন আধার খোঁজে তখন জলপাইগুড়ির মানুষজন ও প্রকৃতির মধ্যেই আমি

সেটাকে সহজে খুঁজে পাই বা পেতে চাই। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র লেখাও শুরু হল সেই সহজ অধিকার বোধ থেকেই।" (সেন, "বাচন ও স্বনির্বাচন" ১০১) এই উপন্যাসে বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা, কৃষক, চা বাগানের শ্রমিক, জোতদার, হাকিম, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা, পার্টি কর্মী, তিস্তানদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে বিশাল ভূখণ্ডের নিসর্গ, প্রকৃতি, অসংখ্য মানুষের কথাবার্তা, নড়া-চড়ায় প্রস্তাবিত উপন্যাসের কথাবৃত্তকে সম্ভবই ছিল না ইংরেজী মডেলের স্বীকৃত ফর্মে আধার দেওয়া। তাই ইতিহাস ও রাজনীতির ভাঙ্গনে, অস্থিত্ব অন্বেষণে পরিধির এক জনগোষ্ঠীর কথা তুলে ধরতে দেবেশ অনুসন্ধান চালিয়েছেন পরিধিতেই প্রচলিত কাহিনি বলার আধারের।

দেবেশ পরিধির আখ্যানকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিস্তানদী সংলগ্ন সমগ্র ভূগোলকেই গেঁথে ফেলেছেন তাঁর উপন্যাসে-

> "ওপরে, সেই মালবাজার-ওদলাবাড়ির কাছে মউয়ামারির চর থেকে শুরু করে নীচে হলদিবাড়ির কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত তিস্তার, মানে, তিস্তা বলতে যে-ভূখণ্ড বোঝায়, তার একেবারে মাঝখানে, লোকবসতি তৈরি হয়ে আসছে অনেক দিন হল। কিন্তু সে অনেক দিনেরও একটা ইতিহাস আছে।
> রাজবংশীরা তিস্তার চরে সাধারণত বসতি গাড়ত না, গাড়ে নি। তারাবরং যেন বেশি অভ্যস্ত ছিল তিস্তার পারে-জঙ্গলের মধ্যে। [...]
>
> নদীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল নদীর স্বভাবের মতই যখন যেমন, তখন তেমন। যে-নদী এমন ঘন-ঘন বদলায়, যে নদী, নদী হিশেবে চিনতে-চিনতেই, ডাঙ্গা হয়ে যায় আর ডাঙ্গা, নদীর ভেতরে চলে যায়, সে নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে নদীকে ব্যবহার করত।"
>
> (রায়, "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" ২০০)

ফলে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' একইসাথে ক্ষমতার সঙ্গে জনমানবের সংঘাতের প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি পরিধির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়াও আছে, পরিধির মানুষজন-নিসর্গ-প্রকৃতি-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক শ্রেণির কর্মপ্রবাহ যেমন আছে তেমনি কেন্দ্র-পরিধির টানাপোড়েনও আছে। সেই টানাপোড়েনেই বাঘারু বারে বারে তার স্থিত অবস্থান হারিয়ে ফেলে, শ্রমিক-কৃষক অনাহারী পেটেও একজোট হতে পারে না, মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্বাধীন ভারতবর্ষের খোঁজ পায় না। ঔপন্যাসিক তার পাঠকের সামনে এমন এক অচেনা জগৎ তুলে ধরেন যেখানে মায়ের সন্তানেরা টেবিল সমান উঁচু হলেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়,আর গয়ানাথের অবৈধ সন্তান আরেক সন্তানের হাত ধরে তিস্তাপারের বৃত্ত ছেড়ে আরেক বৃত্তান্তের খোঁজে পাড়ি দেয়। সমালোচক সরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঘারু' চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-

> "পরিবর্তমান ভূ-প্রকৃতি এবং আর্থ সামাজিক পটে বাঘারুর অপরিবর্তনীয়তা আর ভাঙচুরের-বাঘারুর নতুন নতুন মূর্তির দ্বান্দ্বিকতা শ্রমনিষ্ঠ কব্জিতে ও মেধাবী প্রত্যয়ে লেখক গড়ে তোলেন, হয়তো বা ভাস্করের পাথুরে কাজের সঙ্গেই তার তুলনা। কখনও বা লোককথার প্রাচীন উপাদান প্রতিমায়িত হয় বাঘারুর একান্ত লৌকিক অথচ ব্যক্তিক অনুভূতি। বাঘারুর শারীরিকতা এবং প্রাচীনতার ছন্দকে দেশকালের তরঙ্গায়িত পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে এ বৃত্তান্ত বিস্তার পায়।" (বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ ১০৫)

লেখকের উপন্যাসযাপন, তার সচেতন রাজনৈতিক ও ইতিহাস চেতনা উপন্যাসের অভ্যন্তরে দেশকালের এক অন্তর্দেশ নির্মাণ করেন যা একইসাথে কেন্দ্রবিমুখ আবার কেন্দ্রানুসারি।

দেবেশ তাঁর উপন্যাসে উত্তরবাংলার ল্যান্ডস্কেপকে প্রায় মানুবিক বিবরনের প্রতিস্পর্ধী করে গড়ে তোলেন- ঔপন্যাসিক নিজেই একে প্রচলিত উপন্যাস মডেলের বিরোধীতা করা বলেছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তিনি প্রকৃতি-নিসর্গের অনুপুঙ্খ ডিটেইলস্-এ পরিধির মানুষজন ও নিসর্গকে নিয়ে আসেন উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বয়ানে। বনপর্বের 'পয়ষট্টি' অধ্যায়ে বাঘারুর সাথে কুকুরের দীর্ঘক্ষণ খেলার বর্ণনা এই বিবরণ আছে। আবার একই পর্বের 'ছাপ্পান্ন' অধ্যায়ে চা শ্রমিক মেয়েদের দল বেঁধে হেটে যাওয়ার বর্ণনা, কিংবা উপন্যাসের শুরুতেই হাটে যাওয়ার বর্নণাও অভূতপূর্ব ডিটেইলসে্ তুলে ধরেছেন লেখক-

> "বেশির ভাগই হেঁটে চলে- মাথায় বা বাঁকে বোঝা ঝুলিয়ে। বাসে হাইওয়েতে নেমে, বাসের মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে, রিক্সায়-রিক্সায় কয়েক মেইল দূরের হাটে যাওয়ার সুবিধে। কিন্তু যারা দক্ষিণে চকমৌলানি থেকে বা উত্তরে সেই হায়হায়পাথার থেকে টাড়ি-বাড়ি-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, নদী-নালা পেরিয়ে পেরিয়ে, বাকে বা মাথায় বোঝা নিয়ে, বা গরু-ছাগল, তাড়িয়ে-তাড়িয়ে রাস্তা ছোট করতে-

> করতে আসে, তাদের আর এই পাকা রাস্তাটুকুতে রিক্সার দরকার কী।[...]কেউ কারো দিকে তাকায়ো না, কথাও বলে না। তাড়াতাড়ি হাঁটার বা মাল বইবার ফলে মানুষজনের দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়। চারপাশ এত নির্জন যে মানুশের শ্বাস নেয়া-ছাড়ার মত প্রায় নিঃশব্দ আওয়াজও মিশে যেতে পারে না, আলাদা হয়ে থাকে।[...]" (রায়, "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" ১৩-১৪)

এই 'ডিটেইলসে'র ব্যাপারে তিনি সচেতনভাবে বিভূতুভূষণের উত্তরসূরী। কিন্তু বিভূতিভূষণের তুলনায় দেবেশের রচনায় স্থানিক ও মানবিক প্রামাণিকতা অনেক বেশী। দেবেশ রায় বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আলোচনায় যে কথা বলেছিলেন একই কথা তাঁর রচনার ক্ষেত্রেও সত্য-"যে কোনো স্থান, যে কোনো মানুষ, যে কোনো স্থানের সঙ্গে যে কোনো স্থানের সম্পর্ক, যে কোনো মানুষের সঙ্গে যে কোনো মানুষের সম্পর্ক এমন ডিটেলস-এ তিনি তৈরি করে তোলেন যে সেই বেঁচে থাকাটাই হয়ে-ওঠে এক আরোপিত গল্পের প্রতিস্পর্ধী।" (রায়, "উপন্যাস নিয়ে" ৩৮) 'চরপর্বে' 'বন্যার মুখে শয্যা' অধ্যায়ে আব্দুলের অবাঞ্ছিত অথচ প্রতিস্পর্ধী স্বর এই বৃত্ত থেকে উদ্ধুত হয়ে বিস্তার পেয়ে যায় আরেক বৃত্তান্তের পরিধিরও বাইরে।

তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিনের 'বহুস্বর' বা 'পলিফনিক ডিসকোর্স' উপন্যাসের শিল্পরূপ আলোচনায় সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। দেবেশ রায় বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ গ্রন্থে বাখতিনের 'ডায়ালজি' ও 'পলিফনি' সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের ভাষাতে 'পলিফনি'র ব্যবহার করেছেন। বাখতিন উপন্যাসের মূল সংলাপকে 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' এই দুই ডিসকোর্সে ভাগ করেন- 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স-এ অর্থের ওপর বক্তার সম্পূর্ণ অধিকার। 'পরোক্ষ ডিসকোর্স'-এ আর-এক ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বাচনে।' (৫১) এছাড়াও বাখতিন সংলাপ সংলগ্ন তৃতীয় আর-একধরনের ডিসকোর্সের কথা বলেন, আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায়, আদানপ্রদানে যখন এক ব্যক্তি অনুপস্থিত আরেক ব্যক্তির কথা বলেন কিংবা তার বাচনভঙ্গি নকল করে দেখান তেমনি ঔপন্যাসিক যখন কাহিনীর বিবরণে চরিত্রের কথা বলেন তখন তার নিজস্ব স্বরও তার মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে এই দ্বিস্বর নিষ্ক্রিয়। বাখতিন তার আলোচনায় এই দুই ধরনের দ্বিস্বর ডিসকোর্সের পাশাপাশি আরো একটি ডিসকোর্সের কথা বলেছেন, যাকে দেবেশ 'স্বক্রিয় দ্বিস্বর ডিসকোর্স' (৫২) নামে চিহ্নিত করেন, সেখানে-"বাইরের কথা সাজানো হয় ভিতরে একটা অর্থ ঢুকিয়ে দিয়ে, সেখানে আত্মকথা বলা হয় বা স্বীকারোক্তি নেয়া হয় আর-একটা কণ্ঠস্বরকে লুকিয়ে রেখে, সেখানে অন্য কোনো বক্তার প্রতি কটাক্ষে কোনো মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়া হয়, সেখানে অন্য কোনো সংলাপের জবাবে কিছু বলে দেয়া হয়, সেখানে সংলাপ গোপন করে কথা বলে যাওয়া হয়।" (৫২) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ডিসকোর্সের সম্মিলনেই বাখতিন কথিত 'ডায়ালজি' তৈরী হয়, আর ডায়ালজি থেকেই আসে পলিফনি। বাখতিনের ভাষায়-

> "The word in living conversation is directly, blatantly, oriented toward a future answer-word: it provoks an answer, anticipates it and structures itself in the answer's direction. Forming itself in an atmosphere of the already spoken, the word is at the same time determined by that which has not yet been said but which is needed and in fact anticipated by answering word. Such is the situation with any living dialogue. The orientation towards an answer is open, blatant and concrete" (Bakhtin, "The Dialogic Imagination" 279).

উপন্যাসে বাঘারুর আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের নিমিত্ত অনর্গল সংলাপ বলে যাওয়াকে এর উদাহারণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে-

> "এম-এল-এ পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরালার নামখান কী হে?' [...]
> বাঘারু খুব নিচু গলায় কথা বলছিল। [...]
> 'মোর মাওখান ত গয়ানাথেরই আছিল। কাজকাম করিত। খোয়া খাইত। আর ফরেস্টের ভিতরত গিয়া শুখা কাঠ, ডালপালা কুড়ি আনিবার নাগিত।" [...] মুই য্যালায় মোর মাওয়ের প্যাটত আসিছু, প্যাটের ভিতরত আসি গেইছু, মাওয়ের প্যাটখান বড় হওয়া ধরিছে, সগায় জানি গেইছে মুই আসিম, স্যালায় সগায় মোক ডাকিবার ধইচছে-"কুড়ানিয়ার ছোয়া"-" (রায়, "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" ৯৪-৯৫)

এ সংলাপে শুধু বাঘারুর নয়, মিলিত হয়েছে বাঘারুসহ এম-এল-এ-র কণ্ঠস্বর, গয়ানাথের নির্দেশ, গয়ানাথের চরিত্র, বাঘারুর মায়ের চরিত্র এবং সর্বোপরি ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বর। আবার এক বা একাধিক চরিত্রেরা যখন কথা বলে তখন সেই কথায় আরো অনেক চরিত্রের অনেক অনেক কণ্ঠস্বর শোনা যায়। উপন্যাসে পাঠক সেই সংলাপের ভিতর দিয়েই চরিত্রের

সাথে পরিচিত হয়, সংলাপই চরিত্রের সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে। বাখতিনের 'পলিফনিক ডিসকোর্স' উপন্যাসপাঠের চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

সমসাময়িক রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজব্যবস্থা ও সর্বোপরি ইতিহাস সচেতন ঔপন্যাসিক দেবেশ উপন্যাসযাপনের স্বভূমি আবিষ্কারের সক্রিয়তাতে যে উপন্যাস রচনা করেন, সে উপন্যাস একই সাথে সমকালীন ও কালোত্তীর্ণ। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আখ্যান কাহিনীতে যে সাম্রাজ্য বিরোধীতার সূত্রপাত করেছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকেরা, দেবেশ সেই আখ্যানকে গ্রহণ করে আবার তাতেই এক নতুন আধুনিকতার রূপ দিয়েছেন। দেবেশ এ কথা বিশ্বাস করেন-"কলোনিতে এমন কোনো লেখক থাকতেই পারেন না যিনি কলোনির সেই জীবনের কাহিনি ছাড়া অন্য কোনো কাহিনি লেখেন। সেই কাহিনিই নতুন তত্ত্বের ভিত্তিতে পুনরুদ্ধার করা গল্প-উপন্যাস লেখকদের কাজ।" (উপন্যাসের বিবিধ সংকট ২৯) সেই অনিবার্যতার দ্বায়িত্ব থেকেই দেবেশের উপন্যাস এমন সাবলীল, এমন স্বাদেশিক, এমন আধুনিক হয়ে উঠেছে।

তথ্যপঞ্জি:

1. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ: *'বাংলা উপন্যাস:দ্বান্দ্বিক দর্পণ'।* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০ মে ১৯৯৬।
2. রায়, দেবেশ: *'উপন্যাস নিয়ে'।* তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৬।
3. *'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে'*। দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬।
4. *'উপন্যাসের বিবিধ সংকট'*। প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৮।
5. *'গল্প সমগ্র'।* তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০।
6. *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'।* দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
7. সেন, অরুন: *'বাচন ও স্বনির্বাচন'।* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, কলকাতা ১৯৯৮।
8. Bakhtin, Mikhail: *'The Dialogic Imagination: Four Essays'.* Ed. Holquist. Michael, Trns. Caryl Emerson and Micheal Holquist. Austin: University pf Texas Press, 1981.